মাসউদ আহমাদ

রূপচানের আশ্চর্য কান্না

ঘনায়মান সন্ধ্যার অল্পকিছু সময় পর, মেম্বারের বাড়ির প্রশস্ত খল্যানে কাচারি বসে। উপস্থিত সমস্ত মানুষের চোখ ও মনোযোগ রূপু ও তার স্ত্রীকে ঘিরে থমকে থাকে। কাচারিতে আসা পেছনের সারির দু-একজন অল্পবয়সী মহিলা গা টিপে নিঃশব্দে বা অট্টহাসিতে সাড়া দিয়ে ওঠে।

আকাশের ভাব ভালো নয়, মেঘ জমেছে। বাতাসে হিমেল আভাস। তাই মেম্বার দেরি করেন না। সরাসরি আলোচনায় ঢুকে পড়েন।

... তো রূপু, তুমার বউকে তালাক দিবা ক্যানে? কুনুরকম কুহারা কইরব্যা না। কাচারিতে উপস্থিত সবাইকে সেই কথা খুল্যা বুলো!

যেকোনো প্রশ্নের মুখে পড়লেই যারা মাথা চুলকায় এবং দিশেহারা বোধ করে, রূপচান তাদের দলভুক্ত। মেম্বর সাহেবের আচমকা প্রশ্নে তার বুকে অপরাধবোধ জেগে ওঠে, কিছুটা ক্ষোভও। তবু মুখ ফসকে সে প্রায় বলেই বসছিল— আমার বউ তালাক দিব, তুমাহারে এত জানার খায়েশ ক্যানে গো?

কিন্তু, রূপচানের মুখে আদৌতে কোনো কথা সরে না। সে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর গ্রামের মেম্বরের খল্যানে সালিশিতে জমায়েত মানুষের মুখ ধীর গতিতে সরেজমিন করে। নিজের ভেতর কিছুটা বিচলিত অনুভূতি সে টের পায়।

মেম্বরের মুঠোফোনটা বেজে ওঠে।

ফোন রিসিভ করবেন কি না একমুহূর্ত ভাবেন তিনি। সংক্ষেপে কথা শেষ করে আবার রূপচানের দিকে তাকান।

কই রূপু, বুল্যা ফ্যালো তুমার যা বুলার। আকাশে ম্যাঘের ভাব কিন্তু ভালো না।

তখন কেউ একজন ফোড়ন কাটে বা রূপুকে উসকে দেয়— তুমার কথা ফুরিয়্যা গ্যালো নাকি রূপু ভাই? কথা না বুললে তো কুনু বিহিত হবে নাগো। তুমি কথা বুলছো না ক্যানে? একবার ঝাড়্যা কাশো। সবাই তো তুমাহারে স্বামী-স্ত্রীর কথা শুনার লাগ্যা এখ্যানে আস্যা বস্যাছে!

একবার সন্তর্পণে স্ত্রীর চোখে তাকায় রূপু। কাচারিতে এসে, মাথায় বড়ো করে ঘোমটা টেনে দিয়েছে কুসুম। লজ্জায় নিজের আরক্ত মুখ ঢেকে রাখার অভিপ্রায়ে, নাকি কেবলই নিজেকে আড়াল করতে— বলা মুশকিল। কাজেই রূপুও কিছু বুঝতে পারে না।

রূপু লোকটি সামান্যতর। লম্বা একহারা শীর্ণ দেহ। নীরস মুখ। মুখের মানচিত্র দেখে ভেতরটা পড়া সহজ নয়। কিন্তু চোখদুটো জ্বলজ্বলে, তাতে কেমন যেন সতর্কতা আর অনিশ্চয়তাও। ঈষৎ ঘাড় ফিরিয়ে স্ত্রীকে দেখেও না দেখার ভনিতা তার।

একটু দম নেয় রূপু। তারপর কেমন অচেনা গলায় সে বলে চলে— আমি আর কী

বুলবো? তুমরাই যা করার করো। কিন্তুক ওই শালিকে আমি আর ঘরে রাখবো না। উই কি আমার গার্জেন হয়্যাছে নাকি? শালির দুঃখে কুনু কথা বুলা যায় না গো। কুনোদিকে তাকান্যা যায় না। আর সারাদিন খালি খ্যাচখ্যাচ চুদায়। অর সাথে ঘর করা আমার পক্ষে সম্ভব লয়। মেলা সহ্য কর্যা যাছি। এমুন দেমাগি ম্যাগিকে আমি তালাক দিব। কথাটুকু শেষ করে রূপু কি একটু হাঁপাতে থাকে? সে টের পায়, তার কপালে মৃদু ঘাম জমেছে।

কাচারিজুড়ে অস্পষ্ট গুঞ্জন। কৌতূহল। কী হয় কী হয়। আর তখন, উপস্থিত লোকজন সামান্য ভড়কে যায় রূপুর এমন মূর্তি দেখে।

কুসুমের বয়স কম, হয়তো ছাব্বিশ। তেত্রিশও হতে পারে। শ্যামলা নয়, বরং চেকনাই কালো শরীর কুসুমের। ঘরে বাবা ছিল না, অত্যন্ত গরিবের সংসার; রূপুর বয়স চোখ বুজেই পঞ্চান্ন বলে ঠাহর হয়— কিংবা আরও বেশি। অসুখে বা শোকে; স্ত্রী-বিয়োগের পর নানারকম ছুটা কাজ করে বেড়ানো মানুষটা আদৌতে খারাপ নয়। বিয়ের জন্য তাতে দু-দিকে সমতা রক্ষা হয়। মেয়েপক্ষ বেঁচে যায়, রূপুরও স্বস্তি মেলে নিঃসঙ্গ জীবনে। দ্বিতীয় বিয়ের পর, নতুন জামাইয়ের অনুভূতি ও আনন্দ রূপুকে উসকে দেয় যেন; শরীর ও মন দুলে ওঠে। কাজে যায় আনন্দ নিয়ে, নিয়মিত। বউমরা উড়নচণ্ডি রূপু ঘরমুখো হয়। সংসারে মনটা ফিরে আসে। প্রতিবেশিরাও রূপুর জীবনের সেই ছবি দেখে চোখে আরাম বোধ করে।

একদিন বিকেলবেলা, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। বিকেল গাঢ় হওয়ার আগেই টুপ করে সন্ধ্যা নেমে আসা দিনে, গায়ের জামার ওপরে মোটা চাদরটা জড়িয়ে রূপু বেরুবে, উঠোনে দাঁড়িয়ে চালের ওপরে লাউয়ের কচি ডগাটা দেখে কী যেন ভাবে।

নতুন বউ বলল, কতি য্যাছো? বেশি রাইত কইরো না!

কথাটা খুবই সাধারণ। দাবিটাও সামান্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু খুশিতে বুকটা ভরে ওঠে রূপুর।

সে হাসি মুখে বলে, ক্যানে গো?

বউটা লাজুক হেসে বলে, রাত হলে একা থ্যাকতে আমার ভয় লাগে।

ওহ। না, এই স্কুলমাঠে থেক্যা একটু ঘুর্যা আসি। রাত হবে না।

সেদিন সন্ধ্যায়, রাস্তায় বেরিয়ে এমনকি স্কুলমাঠের পাশে চায়ের দোকানে অন্যসব লোকের সঙ্গে গল্প করার ফাঁকে কমদামি সিগারেট আর র-চা খেতে খেতে, বউয়ের কথাটা ভাবায় তাকে। সামান্য আনন্দিতও কি করে না? এতদিনের দাম্পত্যজীবনে, প্রথম বউয়ের মুখে এমন কথা সে কোনোদিনই শোনেনি। তৃতীয় বাচ্চা হতে গিয়ে বউটা মারা গেল। পরে, দীর্ঘদিন একাই জীবনটা বয়ে নিয়েছে সে। কিন্তু ভালোবাসা জিনিসটার গন্ধ বা আভাস সে পায়নি। তাই নতুন বউয়ের কথাটা একেবারে আনকোরা এবং লাবণ্যময় ঠেকে তার কাছে। অভূতপূর্ব। নতুন বউয়ের কথাটুকু বারবার তার কানে অনুরণিত হয়ে চলে। মেয়েমানুষকে সে কখনো ভালোবাসতে পারেনি। কিন্তু কমবয়সী বউটা পেরেছে, অন্তর দিয়ে ... এসব ভেবে সেই সন্ধ্যাটা বেশ প্রাণবন্ত লাগে।

কাচারিতে কেবল পুরুষই নয়, বেশ ক'জন মহিলাও উপস্থিত হয়েছে। ফজার বউ জয়াও বসে আছে কান খাড়া করে। রূপুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পাশের মহিলার গা টিপে সে ফিক করে হেসে দেয়। রূপু হাসতে গিয়েও ভুরু কুঁচকে সতর্ক হয়। খুব দুষ্টু মহিলা শেফালি। একদিন, পুবপাড়া থেকে বেরিয়ে, গ্রামের মসজিদ পেরুলেই শানবাঁধানো বড়ো পুকুর। দুপুরে, বেলা খানিকটা পড়ে এসেছে; রূপচান হেঁটে চলেছে বাজারের দিকে। কাঁধে লাড্ডু আর বিস্কুট। হাটের দিনে বা অন্যদিনেও ফেরি করে বেড়ায়। হাতে থাকে বাঁশি। যেতে যেতে একসময় কোনোদিকে না-তাকিয়ে পথের পাশেই প্রস্রাব করতে বসে যায় রূপু। পুকুরে স্নান করতে আসা মহিলাদের কেউ কেউ দৃশ্যটি দেখে ফেলে। গা টিপে খুব হাসাহাসি করে। কাজ শেষ করে রূপু বড়ো রাস্তায় উঠে আসে। তখন, জয়া এগিয়ে আসে— ও রূপু ভাই, তুমার সব যে দেখ্যালিনু ...

রূপচানের মুখে কথা তেমন বেরুচ্ছে না, এই ফাঁকে উপস্থিত লোকজন নিজেদের মধ্যে গুনগুন করে কথা বলে, ফিসফিস করে। রূপুর আগের বউয়ের মেয়েটা বসেছে সৎ মায়ের গা ঘেঁষে। সেটা দেখে বিরক্তিতে রূপুর ভুরু ছোটো হয়ে এল। মেয়েটা ইদানিং রূপুকে দেখতেই পারে না। বাপের জন্যে কোনো মায়া নেই, ভক্তিও নয়। মনে পড়ে, একদিন দুপুরবেলা, বাইরে থেকে এসেই মেয়েকে ডাকে রূপু—

মরিয়ম, ও মরিয়ম, তুমার মা আজ কী রাইন্ধ্যাছে গো?

শেষবেলায় উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল মেয়েটা, সে, ঝাঁট দেওয়া না-থামিয়েই বলে, শাক আর আলুভর্তা দিয়্যা ভাত রাইন্ধিছে, আব্বা।

শাক-ভাত রান্নার কথা শুনে মুখটা যেন বিস্বাদে ভরে যায় রূপচানের। সে, ক্লান্ত শরীরেই একচোট রেগে উঠল; বিস্কিটের বাক্সোটা ধড়াম শব্দে দূরে আছড়ে পড়ল। গলার স্বরও কিছুটা বদলে গেল তার— ধুর, রোজ রোজ উয়া কি খাওয়া যায়? শালি কিছু প্যালো না? ওসব তুমার মায়ের মাঙ্গে ঢুকাতে বুলো গা...

মরিয়ম তখন ঝাঁটা হাতে সটান দাঁড়িয়ে পড়ে এবং তার বিস্মিত চোখের সঙ্গে মুখটাও কিছুটা হাঁ হয়ে পড়ে। খানিক পরে, মুখটা আড়াল করে সে বলতে ছাড়ে না— তুমি বাজার থেক্যা ভালো তরকারি কিছু না অ্যানলে মা কোত্থেক্যা লিয়ে আসবে? লাটসাহিবের মুতোন রাস্তায় ঘুইরি বেড়ালেই হবে নাকি?

মেয়ের কথা বাণে রূপুর মাথা হেঁট হয়ে যায়। সে কথা না বাড়িয়ে বারান্দায় গিয়ে ধপাস করে বসে পড়ে।

মেম্বর ধমক লাগায়— রূপু, কী হল তুমার? কানে কি কথা য্যাছে না? ফড়ফড় কয়্যা কথা বাহির করো...

আরও একবার, নীরবে রূপু সবার মুখের দিকে তাকায় এবং অত্যন্ত শীতল আর অসহায় গলায় বলে, উ শালির সাথে আমার বনিবনা হয় না। পান থিক্যা চুন খসার জো নাই। আর কী দেমাগ শালির, রোখ দেখলে মুনে বুলে বাড়িঘর থুয়্যা জঙ্গলে যায়্যা থাকি। আমার অসুখ শরীল। কেহু আমাকে কাজে ডাকে না। আমি কী কইরবো? যা পারি, এডা ওডা করে চালাই।

অর সাথে আমি আর ঘর কইরতে চাহি ন্যাকো। অত দেমাগি মেয়্যালোক আমার পুষাছে না। তালাক দিব। ... বলে ফুঁপিয়ে ওঠে সে।

অশ্রুতে রূপুর চোখ হয়তো চিকচিক করে ওঠে। কিন্তু সেই দৃশ্য কাচারির মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না— রূপু কথা শেষ করে মুখটা দু-হাঁটুর মাঝে আড়াল করে ফেলে।

এত কাছে বসে আছে রূপু, তবুও মনে হতে থাকে, তার কণ্ঠস্বর বহুদুর থেকে ভেসে আসছে। ইথারে যেমন করে ভেসে আসে কথা বা শব্দতরঙ্গ, ঠিক তেমন।

কাচারির লোকজন চুপ মেরে যায়। মেম্বর সাহেব হয়তো উপস্থিত মানুষের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেন। কেউ কোনোরকম সাড়া দেয় না।

রূপুর নাকে-কান্না বা অসহায় আর্তি কেউ শুনতে চায় না, মূল্যও দেয় না।

বয়স্ক একজন পুরুষ বলেন, এডাই তুমার শেষ কথা, রূপু?

মুহূর্তটুকুও সময় নেয় না রূপচান— হ্যাঁ, আমার আর কুনু কথা নাই। আমি গরিব মানুষ। আমার এক কথা। উ কি লাটসাহেবের মেয়্যা নাকি? তুমরা একটা ফয়সালা করো।

রূপচানের বউটা যে বেশ চঞ্চল-তেজি এবং সাহসীও, বিজ্ঞাপনের মতন কমবেশি সবার জানা কথা। কিন্তু তবুও, পাড়ায় কারও বউ অমন হতেই পারে; গ্রামের মানুষ এমনটি ভেবে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু আজ ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ আর একমাত্র হয়ে উঠেছে সালিশে।

মেম্বরের পাশেই বসেছিলেন চাঁনমিয়া। তিনি মেম্বরের খুব পেয়ারের লোক, অন্য পাড়ায় বাড়ি; বেড়াতে এসেছেন। একবার গলা খাঁকারি দিয়ে তিনি মীমাংসার সুরে বললেন, দেখো বাবাজি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দু-কথা হয়। ওসব গা করতে নাই। তুমি না হয় আর একটু ভাবো। এখনও সময় আছে।

সটান মুখ বাড়িয়ে দেয় রূপু— আমি এককথার মানুষ। গরিব বুল্যা কি আমার জবানের দাম নাই গো?

অনেকক্ষণ পর, মেম্বর মুখ তুলে কুসুমের দিকে দৃষ্টি দেন।

ও কুসুম, তুমার কুনু কথা আছে? তুমি কিছু বুলব্যা?

মেম্বরের প্রশ্নে কুসুম কি তখন ভীষণ ভাবনায় পড়ে যায়? তেমন কোনো আভাস পাওয়া যায় না বা মুখ তুলে সামান্য এপাশ-ওপাশ করা ছাড়া কুসুম নীরবই থাকে।

কাচারির ঘনায়মান বৃত্তের ভেতর নৈঃশব্দ্য নেমে আসে।

ও কুসুম, তুমি কী অত ভাবতে ল্যাগিছো? তুমার যা বুলার তাড়াতাড়ি বুল্যা ফেলো। লোকজনের কাজ আছে... তবুও নিশ্চুপ কুসুম, টু শব্দটিও সে করে না।

তখন, আরও খানিক নৈঃশব্দ্যে ডুবে যায় কাচারির গুন গুন এবং মানুষের কথা বা নিঃশ্বাসের শব্দগুলোও। তারপর, ভিড়ের ভেতর থেকে হঠাৎ কেউ একজন বলে ওঠে— মেয়ে মানুষের মন তো, ঘর ছাড়তে চাহায় না।

তাকে থামিয়ে আর একটি গলা উঁচু হয়ে ওঠে— ঘর না থাকলে স্ত্রীলোকের আর কী আছে বুলো দেখি, অ্যাঁ? মুহূর্তে ঘটে যায় অকপট দৃশ্যটুকু— শাড়ির আঁচল ভালো করে মাথায়

টেনে দাঁড়িয়ে যায় কুসুম এবং কোনো ভণিতা ছাড়াই সে একটানা বলে চলে— এসব কীসের কথা বুলছো গো মরিয়মের বাপ, তুমি আমাক কী তালাক দিব্যা? শুনেন মেম্বর সাহেব, আমিই ওর সংসারে থ্যাকতে চাহাই ন্যা। কী সুখে র‍্যাখ্যাছো তুমি আমাকে, মানুষ কি জানে না মুনে কর‍্যা যাছ? তুমার কাছে আইস্যা আমার জীবনডা ত্যানাত্যানা হয়্যা গেলছে।

একফাঁকে রূপু আড়চোখে বউয়ের মুখে তাকায়, দেখে, বউয়ের দু-গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। মুখটাও থমথমে। তখন, হঠাৎ বুকের ভেতর হু হু করে ওঠে তার। সে চোখ বুজে ফেলে। বউয়ের জন্য কিছুটা মায়াও তৈরি হয়। কিন্তু মায়াটুকু মনে ভেতরেই চেপে রাখে। প্রকাশ করে না।

হাতের উল্টোপিঠে চোখ মোছে কুসুম। আবার কথা বলে ওঠে— মেয়্যা মানুষের কথার তো কুনু দাম নাই। আপনারা গুরুজন, যা আদেশ করবেন, মান্যা লিবো। বাপ মরা গরিব ঘরের মেয়্যা আমি। উ তালাক দিলে কতি যাব আমি বুলেন তো? আমি কুনুঠি যাব না। কিন্তুক আমার শুধু একটা কথা বুলার আছে— আমার স্বামীকে বুলেন, বিহ্যার সুমায় আমার চেহারা-সুরত আর শরীল য্যামুন দেখ্যা লিয়ে আইস্যাছিলো, আবার ত্যামুন কর‍্যা আমাকে আমার মায়ের বাড়ি থুয়্যা আসুক। আমার আর কুনু কথা বা দাবি নাই...

সালিশের লোকজন কিছু সময় বাকরুদ্ধ থাকে। তাদের কেউ চমকে ওঠে কিনা বোঝা যায় না। রূপচানের মুখটা কেবল হা হয়ে ওঠে, পরিষ্কার দেখা যায়। মেম্বর কিছু বলবেন কী— তার চোয়ালও প্রায় ঝুলে পড়ে। ভ্যাবাচেকা খেয়ে তিনি মুখে কথা খুঁজে ফেরেন। কথা তবু সরে না এতটুকু।

মেম্বরের পাশের চেয়ারে বসেছিলেন হানিফ মাস্টার। এবার তিনি মুখ খুললেন— দেখো রূপু, মানুষের জীবনে এমন হয়। 'মানুষ' শব্দের অর্থই হচ্ছে ভুল। তুমি কম পড়াশোনা জানা মানুষ, তোমার এসব জেনে কাজ নাই। সংসার করতে গেলে নানারকম ঝগড়া কাজিয়্যা লাগে। এসব ম্যাথায় র‍্যাখলে কি চলে? আমি বলি কী— যা হওয়ার হয়্যাছে। তুমি বউকে লিয়্যা বাড়ি যাও। এই মুনশি! মুনশি কই...

মেম্বর ও গণ্যমান্যরা চেয়ারে এবং সাধারণ মানুষ পাটিতে বসেছে। লোকজনও কম।

দূর থেকে মুনশি সাড়া দিলেন।

মেম্বর বললেন, তুমি ওকে কিছু নসিহত করো।

সবাই নয়, কিন্তু কেউ কেউ জানে যে, মেম্বর এই গ্রামের মাতব্বর হলেও ক্ষমতা ও রোখ প্রকাশে নির্মম ও রুক্ষ নয়। হয়তো মানবিক। কাচারিতে যেসব বিষয় নিয়ে সালিশ বা বিচার হয়, চূড়ান্ত ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুনোর জন্যই। সেখানে যতটা কঠোর মনোভাবাপন্ন হওয়াটা দরকার ও স্বাভাবিক, তিনি তা নন; বরং খানিকটা বিপরীত। তিনি অপরাধ-অপরাধী ও বাদী— সবার দিকটাই দেখেন, দেখার চেষ্টা করেন, মানবিক মন নিয়ে। মেম্বর তাই নিজে চুপ থেকে মুনশিকে তুলে দিলেন।

মুনশি বললেন, আমি আর কী বুলবো? তালাক তো হচ্ছে না।

তালাকের চিন্তা যাতে মাথা থেক্যা পালায়, তাকে কিছু কথা বুলো!

মুনশি মেম্বরের খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন। রূপু ও কুসুমকে দাঁড়াতে অনুরোধ করলেন। এরপর দরাজ গলায় বললেন—

শোনো রূপু ভাই, একবার এক ব্যক্তি খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর নিকট নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে এল। এসে যা দেখল, তাতে লোকটি হতাশ হয়ে গেল। সে দেখল যে, খলিফার স্ত্রী নিজ স্বামীকেই চিৎকার করে কথা বলছেন। বকাঝকা করছেন। কর্কশ উক্তি করছেন। কিন্তু খলিফা কিছু না বলে স্থির ও শান্ত থাকলেন এবং নীরবে স্ত্রীর গালমন্দ শুনে গেলেন। এসব দেখে লোকটি ফিরে যাচ্ছিল। খলিফা লোকটিকে ডেকে তার প্রত্যাবর্তনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি সবকিছু খুলে বলল। হযরত ওমর তখন বিশাল রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন এবং তিনি সরকারি তহবিল থেকে অতি সামান্য ভাতা গ্রহণ করতেন। গৃহকার্যে স্ত্রীকে সহযোগিতা করার জন্য কোনো চাকর-চাকরানি রাখার সঙ্গতি তাঁর ছিল না। তখন, ওই লোকটির স্ত্রীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শুনে খলিফা তাকে বললেন, 'কিন্তু তবুও তো স্ত্রী আমার নানারকম খেদমত করে। সে আমাদের জন্য রান্নাবান্না করে। আমাদের গৃহ পরিচালনা করে। আমার সন্তানের দেখভাল করে। আমার সেবা করে। অতএব, মাঝে মাঝে স্ত্রীর সামান্যকিছু জ্বালাতন সহ্য করলে তেমন বেশি কী-ই বা করা হলো, বলো!' তাই বলি কী, তুমি ব্যাপারটা এত জটিল কর্‍্যা লিয়ো না। মুনশি কথা শেষ করে বসে পড়লেন।

মেম্বর হঠাৎ গলা ছেড়ে ফয়েজকে ডেকে ওঠেন— ফয়েজ, এই ফয়েজ। সালিশ শেষ রূপু। বউ লিয়ে বাড়ি যাও। আর যেন এসব না শুনি।

ফয়েজ এসে বলল, জি চাচা?

মেম্বর বললেন, বারান্দায় মিঠাই আছে। সবাইকে হাতে হাতে দিয়ে দাও।

মিঠাই হাতে পেয়ে খেতে খেতে উপস্থিত লোকজন উঠতে শুরু করে।

আকাশে গুরগুর করে কিছু মেঘ কি ডেকে উঠল?

তখন, মুখ ঝামটা দিয়ে বউ চলে যায় বাড়ির দিকে, হনহন করে। ধীরে ধীরে কাচারির মানুষও একে একে উঠে যায়।

অন্ধকারে নিতান্ত অবহেলায় পা ফেলে রূপচান বাড়ির পথে ধরে। বেশ খানিকটা দূরত্বে বউয়ের হেঁটে যাওয়া দেখে এবং তার খুব ভোঁতা অনুভূতি হয়। কতকিছুই যে মনে আসে রূপু ওরফে রূপচানের— আবারও সেই ঘর, সেই দেমাগি বউয়ের ফোঁস করে ওঠা মুখ, পানসে ঘর-মন-জানালা ও সংসার, আবার পুরোনো ঘরে নতুন চাউনির অল্পবয়সী রাগী বউ... বউয়ের হাতের ভাত... বউয়ের শরীরের মাতাল করা গন্ধ, বউয়ের টকঝাল ঠেঙ্গানি... কিন্তু এটুকু সে স্পষ্টই বুঝে নেয়— তার আসলে আর কিছুই করার থাকল না। তার কোথাও যাওয়ার নেই, বউকে দূরে সরিয়ে। আর এটা তো সত্যি যে, সংসার থেকে শালির মন একেবারে উঠ্যা গেলছে গো!

রূপু ভাবে। ভেবে চলে, একা-একা হেঁটে যেতে যেতে।

আকাশের সিঁড়ি বেয়ে গাঢ় ভঙ্গিতে রাত নামতে থাকে।